বেদ-এর অবদান

অপ্রকাশিত

AMARBOI.COM

রচনাকাল ২১. ৬. ১৩৮৩.

বেদ-এর অবদান

সভ্য মানব সমাজে ধর্ম বহু এবং ধর্মগ্রন্থও অনেক। এগুলির মধ্যে কয়েকখানাকে দাবী করা হয় ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলে। অর্থাৎ এ কোনো মানুষের রচিত নয়, স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী। যথা — হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ 'বেদ', পারসিকদের 'জেন্দ আভেস্তা', ইহুদীদের 'তৌরিত', খৃষ্টানদের 'ইঞ্জিল' (বাইবেল), মুসলমানদের পবিত্র 'কোরান' ইত্যাদি।

ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে যে কয়খানা সুপ্রসিদ্ধ, তা কোনো এক সময়ে বা কোনো এক দেশে রচিত বা প্রত্যাদিষ্ট নয়, উহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে রচিত বা প্রত্যাদিষ্ট। তবে এর প্রকাশকরূপে এক একজন পুরুষকে দেখা যায় সব ক্ষেত্রেই। কিন্তু 'বেদ'-এর বেলায় দেখা যায় কিছুটা ব্যতিক্রম।

'ঋগ্বেদ'-এ ২১৪ জন ঋষির নাম পাওয়া যায় এবং ঐগুলির মধ্যে স্ত্রীলোকের নামও আছে ১২টি। মনে হয় যে, তাঁরা সকলেই বেদের কোনো না কোনো অংশের রচয়িতা। বস্তুত বেদ কোনো এক ব্যক্তির রচিত নয়, এর শ্লোকগুলো (ঋকসমূহ) তৎকালীন বহু আর্য ঋষির ধ্যান-ধারণা, অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সৃষ্টি।

ঐতিহাসিকদের মতে ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে 'ঋগ্বেদ' সর্বাপেক্ষা পুরাতন। এর বর্তমান বয়স প্রায় পাঁচ হাজার বছর। পক্ষান্তরে জেন্দ-আভেস্তার বয়স প্রায় পৌনে চার হাজার বছর। তৌরিতের প্রায় সোয়া তিন হাজার বছর, ইঞ্জিলের প্রায় দু'হাজার বছর এবং পবিত্র কোরানের বয়স প্রায় চোদ্দ শত বছর মাত্র।

বেদ চার ভাগে বিভক্ত। যথা — ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। এদেশের আর্য হিন্দুদের একান্ত বিশ্বাস যে, পরমপিতা ভগবান অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা — এই চারজন ঋষিকে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধচিত্ত দেখে এঁদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে, এই চারজনের মুখ দিয়ে ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব — এই চারটি বেদ প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, 'বেদ' সেই অনাদি, অনন্ত ঈশ্বরের নিঃশ্বাসে সৃষ্টি ; কোনো মনুষ্য এর রচয়িতা নয়। বেদ অপৌরুষেয়।

বেদ চতুষ্টয়ের মধ্যে ঋগ্বেদ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও মূল্যবান। আমরা নিম্নে এই বেদ থেকে কতিপয় শ্লোক বা ঋক উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করছি। এতে অতি সহজেই বোধগম্য হবে যে, শ্লোকগুলোর রচনাকারী কোনো মনুষ্য, না পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান। শ্লোকগুলোর অধিকাংশই

AMARBOI.COM

প্রথম মণ্ডলের সূক্তসকল হতে উদ্ধৃত হচ্ছে।

> 'আমাদিগকে সম্যকরূপে গাভী প্রেরণ কর।' (১০ ; ৮)
>
> 'শোভনীয় সহস্র গো ও অশ্ব দ্বারা আমাদিগকে প্রশংসনীয় কর।' (২৯ ; ৩)
>
> 'হে প্রকৃষ্ট বুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্র! আমাদিগকে প্রভূত ধন দান করিয়া আমাদিগের নিকট ব্যাপারীর মত হইও না।' অর্থাৎ দানের প্রতিদান চেয়োনা। (৩৩ ; ৩)
>
> 'হে উষে! আমি যেন যশোযুক্ত, বীরযুক্ত, দাসবিশিষ্ট এবং অশ্বযুক্ত ধনপ্রাপ্ত হই।' (৯২ ; ৮)
>
> 'হে ইন্দ্র! যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি শক্রতাচরণ করে, বজ্র দ্বারা তাহাকে বিনাশ কর।' (১৩১ ; ৭)
>
> 'হে বায়ু, তুমি শত সহস্র সংখ্যক নিযুতে (ঘোড়াতে) আরোহণ করিয়া অভিমত সিদ্ধির জন্য এবং হবি ভক্ষণের জন্য আমাদিগের যজ্ঞে উপস্থিত হও।' (১৩৫ ; ৩)
>
> 'যে গৃহে মৃত গমন করিতেছে, সেই অশ্ব স্থানে গমন কর, ইন্দ্র! সেই স্থানে গমন কর।' (১৩৫ ; ৭)
>
> 'হে স্বাদু পিতু (অন্ন), হে মধুর পিতু! আমরা তোমার সেবা করি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।' (১৮৭ ; ২)
>
> 'আমরা প্রভূত জল ও (যবাদি) ওষধি ভক্ষণ করি ; অতএব হে শরীর! তুমি স্থূল হও।' (১৮৭ ; ৮)

দস্যু ও অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের প্রতি আর্যদের বিদ্বেষভাব ছিল অত্যধিক। তাঁরা ওদের শত শত অভিশাপ দিয়েছেন। নিম্নে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

> 'হিংসক-শত্রুনাশক বরুণকে আমি আহ্বান করি।' (২য় সূক্ত, ৪ ঋক)
>
> 'হে অগ্নি! আমাদিগের বিদ্বেষীগণ রাক্ষসের সহিত যুক্ত হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে দহন কর।' (১২ ; ৫)
>
> 'সমস্ত আক্রমণকারীকে হনন কর, হিংসাকারীকে বিনাশ কর।' (২৯ ; ৭)
>
> 'তোমার প্রতপ্ত বজ্র তাহাদের উপরে নিক্ষেপ কর, তাহাদিগকে উন্মূলিত কর, তাহাদিগকে বিদীর্ণ কর, এই রাক্ষসকে শক্তিহীন, বধ ও পরাস্ত কর।' (ঋগ্বেদ ৩য়, ৩০ ; ১৬-১৭)

বৈদিক যুগে প্রতিমা পূজার প্রচলন ছিল না, ছিল যজ্ঞ প্রথা। ঋষিগণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঘৃত বা সোমরস (মদ্যবিশেষ) আহুতি (ছিটিয়ে) দিতেন এবং উপরোক্তরূপ কোনো না কোনো মন্ত্র (শ্লোক বা ঋক) আওড়াতেন। এটাই ছিল সাধারণ যজ্ঞ। এ ছাড়া গোমেধ, অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি

AMARBOI.COM

যজ্ঞানুষ্ঠান মহা ধুমধামের সাথে পালন করা হ'ত। ঋষিদের ধারণা ছিল যে, যজ্ঞাহুতি দানকালে ইষ্টদেবের কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করা হলে, ইষ্টদেব প্রার্থীর সে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে থাকেন। তাই ঋষিগণ রচনা করেছেন নানা দেব-দেবীকে উদ্দেশ্য করে নানাবিধ ছন্দোবদ্ধ স্তুতিবাক্য বা প্রার্থনা। প্রার্থনাগুলোকে বলা হয় 'ঋক' এবং ওর রচনাকারীকে বলা হয় 'ঋষি', আর শত শত বছরের শত শত ঋষির রচিত ঋকগুলোর সংকলিত গ্রন্থকে বলা হয় 'ঋগ্বেদ'। অন্য বেদত্রয় ঋগ্বেদেরই শাখাবিশেষ। 'বেদ' যে মনুষ্য কর্তৃক রচিত, সে বিষয়ে আর বেশী বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, পূর্বোক্ত ঋকগুলোই তার প্রমাণ।

বৈদিকোত্তর ধর্মসমূহের প্রায় প্রত্যেক ধর্মেই এক একজন ধর্মগুরু বা ধর্মবেত্তা ছিলেন। যেমন — পার্শি ধর্মে জোরওয়াস্টার, ইহুদী ধর্মে মূসা (আ.), খ্রীষ্টান ধর্মে ঈসা (আ.), ইসলাম ধর্মে হজরত মোহাম্মদ (দ.), জৈন ধর্মে ঋষভদেব, শিখ ধর্মে নানক, ব্রাহ্ম ধর্মে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইত্যাদি। কিন্তু বৈদিক ধর্মে সেরূপ বিশেষ কোনো 'একজন' ধর্মগুরু ছিলেন না। বৈদিক ধর্মের উপদেশকরা ছিলেন সংখ্যায় বহু। কাজেই উপাস্য দেবতা, উপাসনা পদ্ধতি এবং ধর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতবাদও বহু। আর শুধু বহু দেব-দেবীর উপাসনাই নয়, আর্যরা উপাসনা বা স্তুতিগান করেছেন কোনো কোনো পশু, পাখী, গাছ-পালা এবং জল, বায়ু, মাটি, পাথর ইত্যাদি জড় পদার্থেরও। তাই প্রবাদ হচ্ছে — 'নানা মুনির নানা মত'।

মরণান্তে 'পরকাল', পরকালে 'বিচার', বিচারান্তে 'স্বর্গ-নরক', স্বর্গ-নরকের 'শ্রেণীবিভাগ' (সংখ্যা) ইত্যাদি বিষয়গুলোও বৈদিক ও পৌরাণিক ঋষিদের কল্পনার সৃষ্টি। এখানে ঋগ্বেদের কয়েকটি ঋক উদ্ধৃত করা হ'ল।

মৃত ব্যক্তির অগ্নি-সৎকার শেষ হয়েছে, তারপর তার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে — "যখন ইনি সজীবত্বপ্রাপ্ত হইবেন, তখন দেবতাদিগের বশতাপন্ন হইবেন" (দশম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের দ্বিতীয় ঋক)। এখানে বলা হচ্ছে যে, মৃত্যুর পর মানুষ পুনর্জীবিত হবে এবং তারা দেবগণের (ফেরেস্তার?) অধীন হবে।

ঐ মণ্ডলের ৫৬তম সূক্তের তৃতীয় ঋকে লিখিত আছে — "যেরূপ উত্তম স্তব করিয়াছিলে তদ্রূপ উত্তম স্বর্গে যাও।" এই ঋকে দেখা যায় যে, পুণ্যের তারতম্যের জন্য 'উত্তম' ও 'অধম', ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গ আছে (সর্বোত্তম ফেরদাউস?)।

নবম মণ্ডলের ১১৩তম সূক্তের অষ্টম ঋকে বলা হয়েছে — "এই যে তৃতীয় নাগলোক, তৃতীয় দিব্যলোক, যাহা নভোমণ্ডলের ঊর্ধ্বে আছে, যথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যে স্থান সর্বদাই আলোময় — তথায় আমাকে অমর কর।" ঋষি এখানে মনে করেছেন যে, স্বর্গরাজ্যটি আকাশমণ্ডলের ঊর্ধ্বভাগে অবস্থিত, সেখানে অবাধে চলাফেরা করা যায়, ওখানে দিন-রাত্রের বালাই নাই, এ স্বতঃস্ফূর্ত আলোকে শোভিত। ওখানে বাস করা যেন তাঁর অনন্তকাল স্থায়ী হয়।

ঐ নবম ঋকে ঋষি প্রার্থনা করছেন — **"যথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যথায় প্রধ্ন নামক দেবতার ধাম আছে, যথায় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তিলাভ হয় — তথায় আমাকে অমর কর।"** ঋষি এখানে এমন একটি দেশ কল্পনা করেছেন, যে দেশে নৈরাশ্যের কোন স্থান নেই এবং যে দেশ প্রচুর তৃপ্তিদায়ক খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ। ঋষি আশা করেন সেদেশে অমর হয়ে থাকতে।

ঐ দশম ঋকে ঋষি বলেন, **"যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ-আহ্লাদ ও আনন্দ বিরাজ করছে,**

AMARBOI.COM

যেখানে অভিলাষী ব্যক্তির তাবত কামনা পূর্ণ হয় — তথায় আমাকে অমর কর।" এই ঋকে ঋষি কল্পনা করেছেন যে, স্বর্গে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ যথা — গান, বাজনা এবং অপ্সরা, কিন্নরী নাম্নী নর্তকী ইত্যাদিও আছে। ঋষি সেখানে অমর হয়ে থাকতে চান।

স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে বহু মত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে এখানে আমরা আর একটি মতের আলোচনা করব। এ মতে জগত তিনটি। যথা — স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। অর্থাৎ উর্ধ্বলোক, মধ্যলোক ও অধঃলোক। আমাদের এই পৃথিবীটাই 'মধ্যলোক' বা 'মর্ত্যলোক'। এখান হতে উর্ধ্বদিকে উর্ধ্বলোক বা স্বর্গ। উহা সাত ভাগে বিভক্ত। যথা — ভূর্লোক, ভূবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। একে সপ্তস্বর্গও (সাত বেহেস্ত?) বলা হয়। মর্ত্যলোকের নিম্নভাগে অধঃলোক বা পাতাল। তাও সাত ভাগে বিভক্ত। যথা — অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল। একে বলা হয় সপ্তনরক (সাত দোজখ?)। এই সপ্ত নরকের আবার অন্য নামও আছে। যথা — অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র, তামিশ্র, অন্ধতামিশ্র ও অবীচি। **সপ্ত নরকের নিম্নতম নরক অবীচি (বোধ হয় যে, অবীচি-এর নামান্তর 'হাবীয়া')**। মানুষ পুণ্যের তারতম্যানুসারে ক্রমান্বয়ে উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বতন স্বর্গের অধিকারী হন এবং পাপের তারতম্যানুসারে নিম্ন হতে নিম্নতম নরকে নিপতিত হয় — এই হল এই মতের সিদ্ধান্ত।

হিন্দুশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, স্বর্গরাজ্যে যাবার পথে 'বৈতরণী' নামক একটি নদী পার হতে হয় (বোধহয় যে, পুল আছে)। ঐ নদীটির জল অগ্নিবৎ গরম, রক্ত-মাংস ও হাড়গোড়ে পরিপূর্ণ, দুর্গন্ধময় ও কৃমীরে ভরা। ঐ নদীটি নিরাপদে পার হবার আশায় হিন্দুগণ মৃত্যুর পূর্বে বা পরে গো-দান করে থাকেন।

হিন্দুদের কোনো কোনো শাস্ত্রে পাপ ও পুণ্যকে তুলাদণ্ডে পরিমাপ করার বিষয় বর্ণিত আছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বের পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ে মহর্ষি ভীষ্ম বলেছেন — "সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং একমাত্র সত্য তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা হইয়াছিল, কিন্তু সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে সত্যই ভারি হইল।"

AMARBOI.COM

আর্য ঋষিদের রচিত বৈদিক ও পৌরাণিক বহু কাহিনী (স্বর্গ, নরক ও বৈতরণী-নদী পার হওয়া ইত্যাদি) ধর্মান্তরে গৃহীত হয়েছে। তবে তা বেদ বা পুরাণের বাণীরূপে নয়, গৃহীত হয়েছে 'ঈশ্বরের (আল্লাহর?) বাণী'রূপে। স্বর্গ ও নরক আর্য ঋষিদের স্বকল্পিত হলেও নরকযন্ত্রণা হতে অব্যাহতি ও স্বর্গীয় সুখলাভের প্রত্যাশায় অগণিত মানুষ তাদের আরাধ্য দেবতার সমীপে মাথা কুটে মরছে।

আর্যঋষিদের কল্পিত স্বর্গ, নরক ও ভীষণ নদী বা সেতু পার হওয়া ইত্যাদি কাহিনীগুলোর পারলৌকিক সত্যতা থাক আর না থাক, এ দ্বারা আমরা এই শিক্ষাই পেয়ে থাকি যে, যাবতীয় সৎকাজের পরিণাম 'সুখময়' এবং অসৎকাজের পরিণাম 'দুঃখময়'। আর যে কোনো মহৎ কাজের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হতে হলে তার যাত্রাপথে বহু বাধাবিঘ্নের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবেই সাফল্যলাভ করা সম্ভব।

ধর্মগ্রন্থের বাণীসমূহ লৌকিক বা অলৌকিক যা-ই হোক, তাতে মানব জীবনের অত্যাবশ্যকীয় বহু মূল্যবান তথ্যও আছে। তাই যাবতীয় ধর্মগ্রন্থই আমাদের পরম শ্রদ্ধার্হ ও সমান আদরণীয়।